হায়দারাবাদ ট্র্যাজেডি

ফাহমিদ-উর-রহমান

উনিশ আর বিশ শতককে বলা যায় মুসলমানদের জন্য এক ক্ষয়িষ্ণুতার যুগ। এ কালে এসে মুসলমানরা যা পেয়েছে তার চেয়ে হারিয়েছে অনেক বেশি। সাম্রাজ্যবাদের রক্তাক্ত থাবা একালে মুসলমানদের যতো বেশি রক্ত ঝরিয়েছে বোধ হয় এর নজির ইতিহাসে খুব একটি পাওয়া যাবে না। দেখতে দেখতে মুসলমান দেশগুলো সাম্রাজ্যবাদের করতলগত হয়েছে। শত শত বছরের মুসলিম ঐক্যের প্রতীক খেলাফত খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গেছে আর সে সাথে মুসলমানদের উপর নির্যাতন আর নিবর্তনের দীর্ঘ ট্র্যাজেডি রচিত হয়েছে। এরকম এক ট্র্যাজেডির নাম হায়দারাবাদ।

> সাম্রাজ্যবাদের প্রধান পুরোহিত বৃটেন শুধু মুসলিম দুনিয়ায় তার খবরদারি আর রক্তক্ষয় করেই ক্ষান্ত হয়নি, উপনিবেশগুলো থেকে বিদায় নেবার সময় তারা এমনসব সমস্যা জিইয়ে রেখে গেছে যার মাশুল আজও মুসলমানদের গুণতে হচ্ছে। এর একটি বড় প্রমাণ হচ্ছে আজকের কাশ্মির। কিন্তু কাশ্মিরের সাথে হায়দারাবাদের পার্থক্য হচ্ছে কাশ্মিরের জনগণ অদ্যাবধি আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী জিহাদ জারি রেখেছে আর হায়দারাবাদের আজাদী-পাগল মানুষের সংগ্রামকে অত্যাচার আর নিবর্তনের স্টিমরোলারের তলায় স্তব্ধ করে দেয়া হয়েছে। স্বাধীন হায়দারাবাদের নাম পৃথিবী মনে রাখেনি। হায়দারাবাদ নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল, তার ছিল স্বাধীন প্রশাসন, প্রতিরক্ষা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা - এসব আজ বিস্মৃত - প্রায়, ইতিহাসের গর্ভে আশ্রয় পেয়েছে।

মীর লায়েক আলীর লেখা The Tragedy of Hyderabad গ্রন্থে হায়দারাবাদের আজাদী-পাগল মানুষের সে বেদনাঘন কাহিনীর বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায়। মীর লায়েক আলী ছিলেন স্বাধীন হায়দারাবাদের শেষ প্রধানমন্ত্রী। আগ্রাসী ভারতের বিরুদ্ধে হায়দারাবাদের প্রতিরোধ যুদ্ধে এই লায়েক আলী তাঁর দেশের স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখার জন্য শেষাবধি লড়াই চালিয়েছিলেন। এ লড়াই যখন চলছিল, ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতের সুসজ্জিত সশস্ত্র বাহিনী স্বাধীন হায়দারাবাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তখন বিশ্বশান্তির মন্ত্র উচ্চারণকারী পুরোহিত দেশগুলো এ অবিচার ও জুলুমের বিরুদ্ধে টু শব্দটিও করেনি। এমনকি জাতিসংঘও না।

হায়দারাবাদের মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ত্রয়োদশ শতকের শেষ দিকে। তখন থেকেই হায়দারাবাদকে কেন্দ্র করে মুসলিম শিল্প-সংস্কৃতির যে বিকাশ ঘটে, তা পুরো দাক্ষিণাত্যকে প্রভাবিত করেছিল। ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও হায়দারাবাদ পুরোপুরি স্বাধীনতা বিসর্জন দেয়নি। ব্রিটিশ সরকারের সাথে চুক্তি সাপেক্ষে একটি দেশীয় রাজ্যে পরিণত হয়। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশের বিদায়ক্ষণেই হায়দারাবাদের ভাগ্য অনিশ্চিত হয়ে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ই সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন বুঝতে পেরেছিল পৃথিবী জুড়ে তার কারবার করবার দিন শেষ হয়ে এসেছে। তখন তারা ভারত ত্যাগের একরকম প্রস্তুতিও নিয়ে ফেলেছিল। ভারতে বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল হিন্দুদের সহযোগিতায়। তাই বিদায়ের কালেও তারা পুরনো মিত্রকে অসন্তুষ্ট করতে চায়নি। ভারত বিভক্ত হোক এবং ভারতের বুক জুড়ে মুসলিম লীগের দাবি মোতাবেক একটি মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হোক মুসলিম বিদ্বেষী বৃটেন কখনোই চায়নি।

ভারতের শেষ ভাইসরয় ছিলেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন। তিনি ছিলেন নেহেরুর ব্যক্তিগত বন্ধু। তিনিও চাননি ভারত বিভক্ত হোক।

কেবলমাত্র কায়েদে আযমের প্রবল ব্যক্তিত্ব ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের সামনে ব্রিটিশ সরকার ও কংগ্রেসের হিন্দু নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানের দাবিকে অখণ্ডনীয় বাস্তবতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। পাকিস্তানের দাবিকে যখন ধূলিসাৎ করা গেল না, তখন নেহেরু ও তার সাম্রাজ্যবাদী বন্ধু মাউন্টব্যাটেন র‌্যাডক্লিফ রোয়েদাদের মাধ্যমে বিকলাঙ্গ পাকিস্তান দেয়ার ব্যবস্থা করলো। মুসলমানদের ন্যায্য দাবি-দাওয়ার প্রতি উপেক্ষা ও ষড়যন্ত্র করে তাদেরকে খর্বাকৃতির পাকিস্তান দেয়ার এসব গোপন পরামর্শের কথা পরবর্তীকালে ল্যারি কলিন্স ও ডোমিনিক লাপিয়ের কৃত Freedom at Midnight গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। দেশ বিভাগের সময় সিদ্ধান্ত হয়েছিল, দেশীয় রাজ্যগুলো তাদের ইচ্ছানুসারে ভারত অথবা পাকিস্তানে যোগ দিতে পারবে অথবা তাদের স্বাধীন সত্তা বজায় রাখতে পারবে। মীর লায়েক আলী জানিয়েছেন, এ সিদ্ধান্ত অনুসারেই হায়দারাবাদের নিজাম মাউন্টব্যাটেনের কাছে চিঠি লিখে জানিয়েছিল, হায়দারাবাদ ভারত বা পাকিস্তান কোনো রাষ্ট্রেই যোগ দিবে না, সে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবেই থাকবে।

মাউন্টব্যাটেন উত্তরে নিজামকে জানান যে, তিনি তার পত্র যথাযথভাবে ব্রিটিশ সরকারের কাছে প্রেরণ করেছেন এবং তিনি খুব শিগগিরই তার উত্তর আশা করছেন। মীর লায়েক আলী লিখেছেন- উত্তরপত্রটি অবশ্য কখনোই আসেনি। কেননা, মাউন্টব্যাটেন পরবর্তীকালে স্বীকার করেছেন, তিনি নিজামের পত্রটি ব্রিটিশ সরকারের নিকট আদৌ প্রেরণ করেননি। মাউন্টব্যাটেনের এই স্বীকৃতির সাথেই যোগ রয়েছে হায়দারাবাদকে নিয়ে ব্রিটিশ সরকার ও কংগ্রেসের হিন্দু নেতৃবৃন্দের গভীর ষড়যন্ত্রের। ভারত বিভাগের পরেও কংগ্রেস মাউন্টব্যাটেনকে স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারেল নিয়োগ করেছিল। এ ছিল তার মুসলমানদের সাথে বেঈমানীর পুরস্কার।

মাউন্টব্যাটেনকে কংগ্রেস কর্তৃক গভর্ণর জেনারেল নিয়োগের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল দেশীয় রাজ্যগুলোকে সুচতুর দক্ষতার সাথে ভারতভুক্ত করা। দেশীয় রাজ্য হিসেবে কাশ্মির ও হায়দারাবাদের গুরুত্ব ছিল সর্বাধিক এবং নেহেরুর দৃষ্টি বেশি করে পড়েছিল এ দুটি রাজ্যের ওপর। দেশ বিভাগের সাথে সাথে হায়দারাবাদ নিজেকে স্বাধীন হিসেবে ঘোষণা করে। সেখানে একটি স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং একটি স্বাধীন সরকারের জন্য যা যা প্রয়োজন তাও চালু করা হয়। কিন্তু অখণ্ড ভারতের স্বপ্নদ্রষ্টা নেহেরু এটা মেনে নিতে পারেননি- ভারতের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে পাকিস্তানের মতো আরেকটি স্বাধীন রাষ্ট্র মাথা উঁচু করে দাঁড়াক। তাই তিনি একে সামরিক আগ্রাসনের মাধ্যমে রাতারাতি দখল করে নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

> আগ্রাসনের তারিখ নির্ধারিত হয় ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮। এ দিনটি নির্ধারণ করার পেছনে একটি কারণ ছিল। এর মাত্র দুদিন আগে কায়েদে আযম ইন্তেকাল করেছিলেন- সমগ্র পাকিস্তান তখন শোকে মুহ্যমান। ভারতীয় সেনা কর্তৃপক্ষ মনে করেছিল, এ সময় হায়দারাবাদে অভিযান চালালে পাকিস্তানের পক্ষ থেকে তেমন কোনো বাধা সৃষ্টি হবে না। কার্যত তাই হয়েছিল। আধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত ভারতীয় বাহিনীর সাথে হায়দারাবাদের সেনাবাহিনী টিকে থাকতে পারেনি। হায়দারাবাদ ভারতের পদানত হয়েছিল। মাত্র পাঁচ দিনের যুদ্ধে ভারতীয় বাহিনী ৭০,০০০ নিরীহ মানুষকে হত্যা করে। লুটতরাজ, নারী ধর্ষণ এগুলো তো ছিলই। এই যে সার্বিক গণহত্যা, ভারতীয় বাহিনীর মানবতা বিরোধী রক্তক্ষয় ও লোকক্ষয়ের বিরুদ্ধে বিশ্ববিবেক চোখ তুলে তাকায়নি।

জাতিসংঘ থেকে খবর এলো- হায়দারাবাদ সংক্রান্ত যে আলোচনা সভা ১৬ সেপ্টেম্বর হওয়ার কথা ছিল, তা ২০ তারিখ পর্যন্ত পিছিয়ে দেয়া হয়েছে। বিশ্বজুড়ে মুসলিম দমনের যে চিত্র একালে আমাদের সামনে স্পষ্ট হচ্ছে, তা একটিই ইঙ্গিত করে, মুসলিম নিবর্তনের ক্ষেত্রে সারা দুনিয়ার সব শক্তিই এক ও অভিন্ন সূত্রে গাঁথা। তাই হায়দারাবাদে ব্রাহ্মণ্যবাদী আগ্রাসনের প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘের চালিকাশক্তিগুলো নিস্ক্রিয়তার অভিনয় করে গেছে।

হায়দারাবাদের যুদ্ধ থেকে আরেকটি জিনিস স্পষ্ট হয়ে ওঠে- মুসলমানের বিপর্যয় তার ভিতর থেকেই যুগে যুগে সূচিত হয়েছে। যুদ্ধে নিজাম বাহিনীর পরাজয় এতো ত্বরিত গতিতে সম্ভব হতো না, যদি হায়দারাবাদ বাহিনীর প্রধান এল এদরুস বিশ্বাসঘাতকতা না করতেন। পলাশীর যুদ্ধে মীর জাফর যে ভূমিকা পালন করেছিলেন সাঈদ আহমদ এল এদরুস তার পুনরাভিনয় করেছিলেন মাত্র। এ আলোচনা সম্পূর্ণ হবে না, যদি বিশ্বাসঘাতক এল এদরুসের পাশে দেশপ্রেমিক কাশেম রিজভীর নাম উচ্চারিত না হয়। এই দেশপ্রেমিক নিজস্ব উদ্যোগে দুই লাখ সদস্যের এক স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করেছিলেন যারা ভারতীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে প্রতিরোধ সৃষ্টি করেছিল।

হায়দারাবাদ আজ ইতিহাস হয়ে গেছে। কিন্তু সে ইতিহাস আমাদের জন্য কতকগুলো দিক নির্দেশনাও রেখে গেছে। অখণ্ড ভারত তত্ত্বের প্রবক্তরা উপমহাদেশব্যাপী ব্রাহ্মণ্যবাদের আধিপত্য বিস্তারের স্বপ্ন এখনো বিসর্জন দেয়নি। এ স্বপ্নের কথা সেই দশম শতাব্দীতে আলবেরুনী তার কিতাবুল হিন্দ-এ পরিস্কারভাবে লিখে গেছেন। মনুসংহিতার সমাজের প্রধানরা যে অন্যের ন্যায্য

দাবি-দাওয়াকে কখনোই মেনে নেয় না, তার কথা আলবেরুনীর চেয়ে সুন্দরভাবে কেউ বলতে পারেননি। আধুনিককালে জওয়াহেরলাল নেহেরু তা □Discovery of India□ গ্রন্থে দক্ষিণ এশিয়াব্যাপী সে স্বপ্ন বিস্তারের কথা পুনরায় উচ্চারণ করেছেন। এ ইতিহাসের পাতাগুলো আজ আমাদের নেড়ে-চেড়ে দেখবার প্রয়োজন আছে বৈকি! কারণ যে শক্তি হায়দারাবাদের বুক চিরে রক্তের বন্যা ছুটিয়েছিল, তারা যে আমাদের আজাদীকে পায়ের তলে পিষে মারবে না তার কোন গ্যারান্টি নেই। সে অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে কাশেম রিজভীর মতো দেশপ্রেমিকদের কোমর বেঁধে দাঁড়ানোর সময় আজ এসেছে।

সূত্রঃ বুকমাস্টার প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত □সাম্রাজ্যবাদ□ গ্রন্থ।

ফাহমিদ-উর-রহমান

ফাহমিদ-উর-রহমান একজন মননশীল প্রাবন্ধিক ও বুদ্ধিজীবী। পেশায় মনোরোগ বিশেষজ্ঞ হলেও ইতিহাস, সংস্কৃতি, ধর্ম, সমাজ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তিনি লিখছেন। সমাজ ও সংস্কৃতি সচেতন বিধায় তিনি আধুনিকতার সমস্যা নিয়ে লিখেছেন। আধুনিকতা ও সাম্রাজ্যবাদের সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ নিয়েও তিনি কথা বলেছেন। তার ঋদ্ধ লেখালেখি নতুন আঙ্গিকে বাঙালি মুসলমানের জাতিসত্তার উপরে আলোকপাত করেছে। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের নামঃ ১। ইকবাল মননে অন্বেষণে (১৯৯৫) ২। অন্য আলোয় দেখা (২০০২) ৩। উত্তর আধুনিকতা (২০০৬) ৪। সেকুলারিজমের সত্য মিথ্যা (২০০৮) ৫। উত্তর আধুনিক মুসলিম মন (২০১০) ৬। সাম্রাজ্যবাদ (২০১২) ৭। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ (২০১৩) ৮। সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও বাংলাদেশ (২০১৪) পাশাপাশি তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে ১। জামাল উদ্দীন আফগানী: নব প্রভাতের সূর্য পুরুষ (২০০৩) ২। মহাবিদ্রোহ ১৮৫৭ (২০০৯) ৩। ফরায়েজী আন্দোলন : আত্মসত্তার রাজনীতি (২০১১)